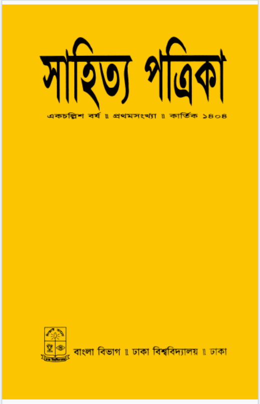

Vol. 41 | No. 1 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আশার ছলনে ভুলি

Volume	41
Issue	1
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Soumitra Sekhar
Published online	October 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v41i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i1.7
Pages	155-168
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-সমালোচনা

গোলাম মুরশিদ, আশার ছলনে ভুলি,

আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩৭৫, মূল্য : ১২০.০০ (ভারতীয়)

'জীবনী' সাহিত্য-শিল্পের একটি শাখা, যেখানে ব্যক্তি-বিশেষ উঠে আসবেন তাঁর ভালো-মন্দ, মহানুভবতা-ঈর্ষাপরায়ণতার প্রতিটি বিন্দু ছুঁয়ে। মধ্যযুগে বাংলায় 'জীবন' অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টি হতে আমরা দেখেছি, তবে শুদ্ধতর অর্থে সাহিত্যিক জীবনী রচনা তারও পরে।

যেহেতু জীবনী 'সাহিত্য-শিল্পে'র অঙ্গীভূত, সেহেতু এর সৃষ্টির পেছনেও অবশ্যম্ভাবী থেকে যায় একটি শৈল্পিক করণকুশলতা। ব্যক্তিভেদে এর মাত্রা হেরফের হলেও এই কুশল বিন্যাস একেবারে শূন্যের কোঠায় হতে পারে না। আর যা' হতেই পারে না তা' হলো জীবনীটির পরিণতি 'অজীবনী'। এজন্যে জীবনী লেখকের অবশ্য-করণীয় দুটো কর্মের কথা উল্লেখ করেছেন আঁদ্রে মোরোয়া ঃ

> জীবনী লেখকের দুটি কাজ। তাঁকে একই সঙ্গে সুনিপুণ প্রতিকৃতি অঙ্কনকারী এবং ঐতিহাসিক হতে হবে। প্রতিকৃতি অঙ্কনকারী হিসাবে তাঁকে গড়তে হবে এমন একটি প্রতিকৃতি যা' যাঁর সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে, তাঁর মতো হয়ে ফুটে উঠবে। শুধু তাই নয়, এতে আবার কিছুটা রঙের প্রলেপও মাখাতে হবে। ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁকে সত্য ঘটনাসমূহ থেকেই বাছাই করে কতকগুলো ঘটনা শৈল্পিক-ছাঁচে বিন্যাস করতে হবে। জীবনী এমন হওয়া চাই, যাতে লিখিত ব্যক্তির জীবন কার্য-পরম্পরার মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করে ; কিন্তু সে বিবরণ সত্য এবং বিশ্বস্ত ঘটনা ও দলিলপত্রের উপর নির্ভরশীল হওয়া আবশ্যক।[১]

উপরিউক্ত মৌল বিবেচনা জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে বিস্মৃত হওয়ার অবকাশ নেই। আর তাই প্রতিটি জীবনীতে সত্যান্বেষণ যেমন অপরিহার্য, তেমনি রস-সৃষ্টির দিকটি বিচারও আবশ্যক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সার্থক প্রতিনিধি বলে অভিহিত হয়ে আসছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ

> পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের পর বাংলাদেশের সাহিত্যে যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে তাহা হইতেই বাংলা-সাহিত্যের ভাবরাজ্যে নবজাগরণ হয় ; এই নবজাগরণ-যুগের প্রথম এবং প্রধান ফল মধুসূদন।[২]

নবযুগের মানবতাবাদ, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকামী এই মহান শিল্পীর মৃত্যুর বিশ বছর পর যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পান 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩) শিরোনামে। বিষয়টি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই বিবেচনা করি, অন্তত সময়ের প্রেক্ষাপটে তো অবশ্যই। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া পানাসক্ত বিষয়বুদ্ধিশূন্য এক 'ম্লেচ্ছ'র জীবনী রচনা ও প্রকাশ সে সময় সম্ভবত সহজ ছিলো না। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অবশ্য সব প্রতিকূলতা তিরোহিত হয়েছিলো, যেজন্যে মধুসূদনের ওপর রচিত স্মৃতিচারণ ও জীবনী গ্রন্থ পরে কম দেখা যায় নি। শশাঙ্কমোহন সেন রচিত 'মধুসূদন ঃ অন্তর্জীবন ও প্রতিভা', মোহিতলাল মজুমদারের 'শ্রীমধুসূদন', প্রমথনাথ বিশীর 'মাইকেল মধুসূদন' (জীবনভাষ্য) গ্রন্থগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হালে সুরেশচন্দ্র মৈত্রের 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থটি অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তের গ্রন্থচতুষ্টয়— 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্য শিল্প', 'নাট্যকার মধুসূদন', 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী', 'মধু বিচিত্রা' ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ও সৃষ্টিকর্মের আলোচনা-পর্যালোচনা বিষয়ক কাজে আদৃত হয়ে আসছে। সম্প্রতি 'আশার ছলনে ভুলি' নামে মধুসূদনের আরও একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ, যিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে লণ্ডন-প্রবাসী ও বেতার-সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই প্রতীকী ব্যঞ্জনার একটি প্রজ্জ্বলন আমাদের চমকিত করে, যা' মধুসূদনের ওপর রচিত এতো দিনকার গতানুগতিক গ্রন্থ-শিরোনাম থেকে স্বতন্ত্র।

গোলাম মুরশিদ রচিত এই জীবনীগ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়, একটি সংযোজন এবং কৃতজ্ঞতা-স্বীকার, তথ্যনির্দেশ, নির্ঘন্ট রয়েছে। অধ্যায়গুলো শিরোনাম যুক্ত. মধুসূদনের কাব্য থেকেই উৎকলিত। অধ্যায় শিরোনামগুলো হচ্ছে ঃ প্রথম অধ্যায়— জননীর ক্রোড়-নীড়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়—সাধিতে মনের সাধ, তৃতীয় অধ্যায়— পরদেশে, চতুর্থ অধ্যায়— মধুচক্র গৌরজনে যাহা, পঞ্চম অধ্যায়— প্রবাসে দৈবের বশে, ষষ্ঠ অধ্যায়— কি ফল লভিনু হায় ; আর সংযোজন—রেখো, মা, দাসেরে মনে, ডাট থেকে ডাটন।

জননীর ক্রোড়-নীড়ের দুটো পর্বে সাগরদাঁড়িতে ও কোলকাতায় মধুসূদনের বাল্য ও শিক্ষাজীবনের বর্ণনা আছে। লেখক শুরু করেছেন তিন পুরুষ এগিয়ে, পরে দেখতে পাবো, অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছিলেন মধুসূদন পরবর্তী তিন পুরুষের পরিচয়

আবিষ্কার পর্যন্ত। মধুসূদন দত্তের প্রপিতামহ রামকিশোর দত্তের পূর্ণাঙ্গ জীবন-তথ্য আবিষ্কার করা না গেলেও লেখক তাঁর যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করে মধুসূদনের জীবনী শুরু করেছেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতা জাহ্নবী দেবী সম্পর্কে অনেক মুল্যবান তথ্য আছে। মধুসূদনের মানস গঠনে যে ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিলো এবং যাঁরা তাঁর সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে রয়েছে আকর্ষণীয় উল্লেখ। এ প্রসঙ্গে তাই অনিবার্যভাবে এসেছে হিন্দু কলেজের মধুসূদনের প্রিয় শিক্ষক ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনসহ (ডি এল আর) ওই কলেজের আরও কয়েকজন শিক্ষকের নাম। এসেছে প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাক—যাকে কবি নিজের জীবনী লিখতে বলেছিলেন যৌবনকালেই—বন্ধু রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম। সাগরদাঁড়ি থেকে কোলকাতায় এসে মধুসূদন কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন অন্য জীবনীকারদের মতো গোলাম মুরশিদও এর সুনিশ্চিত তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কবির হিন্দু কলেজে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে লেখক জীবনীর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয়েছেন। হিন্দু কলেজে অধ্যায়নকালেই মূলত মধুসূদনের মানস গড়ে উঠতে থাকে। বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দ্রুত অগ্রসরমানতার সঙ্গে পরিচয় এ সময়ই। প্রথম রচনা (কবিতা) প্রকাশ ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে। এর পর থেকে পাহাড় আর সাগরের প্রতি আকর্ষণ, আর দুর্দমনীয় আন্তরিক টান অনুভব পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতের প্রতি।

'সাধিতে মনের সাধ' : মধুসূদন যে কতো গুরুতর ও মারাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, অগ্র-পশ্চাত চিন্তা না করেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার বর্ণনা আছে। কবির খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ, সাহিত্যবোধের পরিবর্তন ও কোলকাতা ত্যাগে বাধ্য হওয়ার কারণসমূহ এখানে উল্লিখিত। একমাত্র সন্তান মধুসূদনের বয়স যখন ১৯ বৎসর তখনই রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। ব্যস্ততার কারণে প্রতিকার করা সম্ভব হয়েছিলো যৎসামান্যই। উপরন্তু কবি ছোট থেকেই ছিলেন যথেষ্ট চাপা স্বভাবের, অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরদাস বসাককেও তিনি ধর্মান্তর গ্রহণের পূর্বাভাস দেননি ; অতএব ভূদেব, রাজনারায়ণদের জানানোর প্রশ্ন কম। ইংল্যাণ্ড গমন ও কবিযশ লোভ মধুসূদনকে এতোই আত্মহারা করে তুলেছিলো যে পিতা কর্তৃক বিবাহের তারিখ নির্ধারণকে তিনি এর প্রধান প্রতিবন্ধক মনে করলেন। সব পিছুটান ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে ধর্মান্তরিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, টমাস ডিয়ালট্রি, আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখের অনুপ্রেরণায় ও সহযোগিতায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তাঁর জীবন হয়ে ওঠে

প্রতিবন্ধকতা পরিবেষ্টিত, বিপদসংকুল। মা-বাবার সান্নিধ্যবঞ্চনা, সমাজের বিরূপতা, হিন্দু কলেজ থেকে বহিষ্কারের ফলে কলেজ পরিবর্তন করে বিশপস্ কলেজে ভর্তি এবং এতে প্রায় দু'বছর নষ্ট হওয়া সর্বোপরি আর্থিক অনটন মধুসূদনের জীবনের এক বিরাট পালাবদল ঘটায়। ধর্ম পরিবর্তন করেও ইংরেজদের আনুকূল্যে তাঁর ইংল্যাণ্ড গমন যখন সম্ভব হলো না, এদিকে বাবাও অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছেন— এমতাবস্থায় তিনি হতে চেয়েছেন মিশনারি, মরিশাসে বা অন্য কোথাও। এই ইচ্ছা কবি-মনের অ্যাডভেঞ্চারাস মানসিকতার পরিচায়ক। জীবনের শেষ পর্যন্ত এই মানসিকতা বজায় ছিলো বলেই তিনি যেতে চেয়েছেন কখনো বিলেতে, কখনো মরিশাসে, কখনো মাদ্রাজে, কখনো ভার্সাই, এমন কি জীবনের শেষ দিকে একেবারে অজ্ঞাত পঞ্চকোটে। হিন্দু কলেজে অধ্যায়নের সময় মধুসূদন পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিশপস্ কলেজে এসে সে মোহমুগ্ধভাব কাটিয়ে ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। শিক্ষক মি. উইদার্স, মি. স্ট্রিট, মি. ওয়েল্ডারম্যানের কাছে ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্য পাঠ গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

> এই কলেজে ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে এতো দিনের ভালোলাগা রোম্যান্টিক সাহিত্যকে তিনি বিবেচনা করেন অগভীর এবং হাল্কা সাহিত্য হিশেবে। সত্যি বলতে কি, এ সময়ে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপক বিবর্তন এবং পরিণতি দেখা দেয়। এজন্যেই বলতে হয় যে, পরিণত বয়সে তিনি যে-সাহিত্য রচনা করেন, তার ভিত্তি অনেকাংশে রচিত হয়েছিলো বিশপস্ কলেজে। এই কলেজে না-পড়লে তিনি পরে যে পণ্ডিত-কবি হয়েছিলেন, তা হতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।[৩]

একাধিক পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার হাতেখড়ি তাঁর এসময়ই। ধর্মান্তরের কারণে পরিবারের সঙ্গে কবির সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে, সমাজ-পরিপার্শ্ব থেকে আসে চরম অবজ্ঞা। এমতাবস্থায় পথ সন্ধানে ২৪ বৎসর বয়সে মধুসূদন মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে কোলকাতা ত্যাগ করেন। রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের আশায় আরও দুটো বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু কোন সন্তান জন্মেনি।

পরদেশ বলতে লেখক বুঝিয়েছেন মাদ্রাজকে। কোলকাতা থেকে জাহাজে মাদ্রাজ তখন দশদিনের পথ ; বাঙালির কাছে পরদেশ বৈ-কি! শুধু দূরত্বে নয়, সংস্কৃতিগত ব্যাপারেও। কবির জীবনের এক বিশেষ অধ্যায় তার মাদ্রাজবাস। এসময় তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের সূচনা যেমন ঘটে, একইভাবে ব্যক্তিজীবনেও রেবেকাকে বিয়ে করে চার সন্তানের জনক হন, ঘটে হেনরিয়েটার সঙ্গে পরিচয়-

প্রণয়। The Captive ladie (১৮৪৯) এখানেই প্রকাশ পায়, কবি সংযুক্ত হন কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গে, সম্পাদক হিসেবে। মাদ্রাজে তাঁর প্রথম চাকরি মাদ্রাজ মেইল অ্যাণ্ড ফিমেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম অ্যাণ্ড বয়েজ ফ্রী ডে স্কুলে, বেতন ৪৬ টাকা। আত্মীয়হীন রেবেকাকে মধুসূদন এখানেই ছাত্রী হিসেবে পান। তাঁদের বিয়ে হয় ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই। ইংরেজি কাব্য রচনা করে যতটুকু প্রশংসা পেয়েছিলেন বিরূপ সমালোচনাও একেবারে কম পাননি। Bengal Hurkaru পত্রিকার সমালোচক তাঁর সমীক্ষা শেষ করেছেন এভাবে ঃ With this we take our leave of M.M.S. Dutt and his poetry. ফলে তিনি অনেকটা নিরাশ হলেন এবং এর পর "অধ্যায়নকেই তপস্যা বলে গণ্য করেছিলেন। সকালে দু' ঘন্টা পড়েন হিব্রু, দুপুরের পর দু' ঘন্টা গ্রিক, বিকেলে তিন ঘন্টা তেলেগু এবং সংস্কৃত, সন্ধ্যে বেলায় দু' ঘন্টা ল্যাটিন আর রাতের বেলায় তিন ঘন্টা ইংরেজি— মোট বারো ঘন্টা।" (পৃ. ১২১) আলেকজাণ্ডার ডাও-এর অনূদিত মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতার ফারসি ভাষায় লেখা হিন্দুস্তানের ইতিহাস থেকে কাহিনী চয়ন করে এসময় মধুসূন Rizia নামে একটি কাব্যনাট্য রচনা করেন এবং এর মধ্য দিয়েই নাটক রচনায় হাতেখড়ি তাঁর। নিজের সম্পাদিত Eurasian পত্রিকায় তিনি 'Rizia' প্রকাশ করতে থাকেন। পরে মধুসূদন Madras Hindu Chronicle পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। লেখক এ পত্রিকাদুটো এবং সমসাময়িক Athenaeum পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে মধুসূদনের সাহিত্য ও কর্ম বিষয়ক প্রামাণিক তথ্য তুলে ধরেছেন। পরবর্তী সময় Madras Spectator নামে দৈনিকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। কবি মাদ্রাজ স্কুলেও চাকরি করেন। সহকর্মী জর্জ হোয়াইটের সঙ্গে অধিকতর সখ্যতা গড়ে ওঠে। সে সূত্রেই হোয়াইট কন্যা হেনরিয়েটার সঙ্গে পরিচয় ও পরে প্রণয়। রেবেকার গর্ভে জন্ম নেয় কবির চারটি সন্তান। দারুণ অর্থ কষ্টে চলছিলো তাঁদের জীবন। এ সময় মধুসূদন জানতে পারেন তাঁর মা এবং পরে বাবার মৃত্যু-সংবাদ। এর পর সব কিছু ফেলে তিনি চলে আসেন কোলকাতায়।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে মাদ্রাজ থেকে কোলকাতায় ফিরে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর বিলেত গমনের পূর্ব অবধি কোলকাতায় বাস ও বাংলা সাহিত্যচর্চা, বিশেষ করে সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টিকারী ও আঙ্গিক-প্রকরণে চরম বিদ্রোহের ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ দেখতে পাই চতুর্থ অধ্যায়ে। এই সময়টুকু তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ। পাইকপাড়ার দুই জমিদারভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপন করে বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডেসহ অবাঙালি দর্শকদের নিমন্ত্রণ করতে চাইলে রত্নাবলী ইংরেজিতে

অনুবাদের দরকার হয় এবং এ দায়িত্ব মধুসূদনের ওপর বর্তায়। নাটকটির অনুবাদ, বিশেষ করে ভাষা এতো প্রশংসিত হয়েছিলো যে, এর ফলে মধুসূদনের অর্থপ্রাপ্তি যেমন ঘটেছিলো, তেমনি সৃষ্টির উন্মাদনাও জেগেছিলো। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে রত্নাবলী ইংরেজি অনুবাদের পর দ্রুত রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রধান রচনাগুলো। মধুসূদনের সাহিত্যসঙ্গী কারা ছিলেন?— এ ধরনের একটি প্রশ্নের অবতারণা করে গোলাম মুরশিদ সঙ্গতভাবেই লক্ষ্য করেছেন যে, তৎকালীন রোমান্টিক কবিদের মতো কবিবন্ধু তাঁর ছিলো না। তিনি যে ধারায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে সর্বাত্মক বিদ্রোহই বলতে হয়—সেই বিদ্রোহের সহযোদ্ধা বা তাঁর চিন্তাকে প্ররোচিত করা কিংবা উস্কে দেয়ার মতো ক্ষমতা ছিলো না বন্ধু গৌরদাস বসাকের। রাজনারায়ণ, কিশোরীচাঁদ, প্যারীচাঁদ কবি অথবা নাট্যকার, আর রঙ্গলাল তো কবির ভাষায় পদ্যলেখক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সাহিত্যকে মধুসূদন যেভাবে আধুনিক ও প্রাগসর মানুষের চিন্তার সঙ্গে একীভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন—সে যাত্রায় তিনি সঙ্গীহীন, একাকী পথিক। এ কারণেই তাঁর স্পর্ধিত উচ্চারণ রাজনারায়ণকে ঃ "বিশ্বনাথের সাহিত্য দর্পণকে আমি কদলি দেখাবো। কোনো সাহিত্য নিতে হলে আমি তা নেবো য়োরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের কাছ থেকে, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে নয়।" এ সময় পিতৃসম্পত্তিতে তাঁর খানিকটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু রেবেকা ও মাদ্রাজে রেখে আসা চারটি (পরে ছোটজন মারা যায়) সন্তানের সঙ্গে একত্রে সংসার করা হয় না। তাঁদের ডিভোর্স হয়নি। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কবির আহ্বানে হেনরিয়েটা কোলকাতায় আসার পর উভয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করেন, ধর্মমতে বিয়ে হয়নি। বাংলায় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির পর এক ধরনের আত্মতুষ্টি মধুসূদনের মধ্যে এসে যায়। ফলে কবিযশের জন্যে নয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যারিস্টার পড়তে রওনা হন ইংল্যাণ্ডে।

কবির জীবনের প্রবাসকাল— ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জীবনের—খুঁটিনাটি তুলে ধরা হয়েছে 'প্রবাসে দৈবের বশে' নামক পঞ্চম অধ্যায়ে। ইংল্যাণ্ডের গ্রেজ ইন-এ কবি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে ভর্তি হওয়ার পর দারুণ অর্থ-কষ্টের সূচনা এবং লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হয়। পিতৃ সম্পত্তি পাওনাদার ও জামিনদারদের অবহেলায় এই অর্থ-কষ্ট চরমে উঠলে হেনরিয়েটা সন্তানসহ কবির কাছে চলে যান। কিন্তু পুরো সংসার চালানোর সঙ্গতি না থাকায় প্রবাসে মধুসূদনকে পাওনাদারের তাগিদ সহ্য, মানবেতর জীবনযাপনই শুধু নয়, চার্চের সাহায্য নিয়ে কোনমতে জীবন বাঁচাতে হয়েছে। পরবর্তী

সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কবি তাঁর এ অবস্থা জানালে বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মধুসূদনের এই দুর্দশা খানিকটা লাঘব হয়েছিলো। বিদ্যাসাগরকে লেখা কবির দুটো পত্রাংশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

(ক) ১৮ জুন ১৮৬৪ তারিখে লিখিত ঃ

> [.....] The first regular Mail that left Calcutta on the 9th of May last ; but, alas! I have been again disappointed. I have been obliged to appeal to the generosity of the English Clergyman here to save us from starvation, and he has just lent me from his 'Poor fund' 25 Francs, that is about I Rs! God alone knows what will become of us if there is no money by the two remaining mails of this month![8]

(খ) ২ অগাস্ট ১৮৬৪ তারিখে লিখিত ঃ

> My poor wife expects to be confined every day and I haven't got more than 2o Rs. in the house![৫]

আর্থিক কষ্টের জন্যে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে তাঁকে যেতে হয়েছে ফ্রান্সে, কম ভাড়ার বাড়িতে থেকেছেন, Paying guest রেখে অর্থ কষ্ট দূর করতে চেয়েছেন। মধুসূদনের প্রবাস জীবনের এতো খুঁটিনাটি তথ্য ইতঃপূর্বে আর কোন জীবনীকার পাঠকের সামনে পরিবেশন করতে পারেন নি। গোলাম মুরশিদ কবির ভাড়া বাড়িগুলোর ঠিকানা অনুসন্ধান করেছেন, খুঁজেছেন ওই সময়ে তাঁর পার্শ্ববর্তী কোন ধরনের অথবা পেশার লোক বাস করতেন। এতে কবির আবাসস্থলের পরিবেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ব্যারিস্টার হয়ে মধুসূদন ফিরে আসেন কোলকাতায়। প্রবাসে থেকে যান হেনরিয়েটা পুত্র-কন্যা নিয়ে। আইন ব্যবসায় ত্বরিত উন্নতি করে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন—এটাই ছিলো কবির মনোবাসনা।

'কি ফল লভিনু হায়' শিরোনামের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যারিস্টার মধুসূদন দত্তের কোলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। কোলকাতা হাইকোর্টে নাম লিখাতে মধুসূদনকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাঙালির খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকে বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি বলে সর্বক্ষেত্রে অতিক্রম করেছেন প্রতিকূলতা। আইন ব্যবসাতেও তাঁর উন্নতি হয়নি। "ইংরেজ বনে গিয়ে বাঙালি সমাজ থেকে তিনি নিজেকে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। আবার ইংরেজ সমাজও তাঁর উপর নির্ভর করতে পারেনি। এর ফলে

কোন দিক থেকেই তাঁর কাছে গণ্ডায় গণ্ডায় মক্কেল এলো না।" (পৃ. ৩১২) তদুপরি মধুসূদন স্পেন্সেস হোটেলের মতো ব্যয়বহুল হোটেলে থাকা ও চেম্বার করায় পূর্ব দেনা পরিশোধ করতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরও তখন কবির ওপর বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে মুরশিদ সাহেব উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য স্টাইলে শহরের বাইরে গিয়ে সপরিবারে ছুটি কাটানোর (টানা তিন মাস) ফলেও তাঁর ব্যবসা ও অর্থের ক্ষতি হতে থাকে। উল্লেখ্য এর আগেই হেনরিয়েটা পুত্র-কন্যা নিয়ে কোলকাতায় আসেন। মক্কেল কমে এলে ব্যারিস্টার এম. এম. ডাটকে যেতে হতো মফঃস্বলে, সেই সূত্রে ঢাকাতেও তিনি আসেন। পানাসক্ত থাকায় নির্জ্জল মদ্যপান এবং নানাবিধ রোগ তাঁকে ভগ্নস্বাস্থ্য করে ফেলে। অধিকন্তু দুশ্চিন্তা ও হতাশায় কবি নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। আইন ব্যবসা বন্ধ করে সংসার চালাতে পঞ্চকোটের ম্যানেজার হতে হয় তাঁকে। এসময় তাঁর গদ্য রচনা 'হেকটর বধ' প্রকাশ পেলেও কবি শারীরিক শক্তি হারাতে থাকেন। ফলে 'মায়া-কানন' ডিকটেশন দিয়ে লিখাতে হয়। এই শারীরিক অক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন কবি মৃত্যু বরণ করেন। অবশ্য এর মাত্র তিনদিন পূর্বে মৃত্যু ঘটে হেনরিয়েটার। মধুসূদনের মৃত্যুর পর দেহ সমাধিস্থ করা নিয়ে পাদ্রিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, কেননা তিনি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান!

গ্রন্থটিতে একটি সংযোজন অংশ আছে, যেখানে মধুসূদনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির নিরিখে লেখক সংক্ষিপ্ত মুল্যায়ন করেছেন। তবে এর 'ডাট থেকে ডাটন' অংশে মুরশিদ সাহেব মধুসূদনের পুত্র-কন্যা ও তৎপরবর্তী বংশধরদের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা' শুধু শ্রম সাধ্যই নয়, একটি দুরূহ কর্ম। এর ফলে মধুসূদন ও তাঁর দত্ত বংশের পূর্বাপর একটি চিত্র পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে।

এ-তো গেলো একটি বর্ণনাত্মক উপস্থাপনা 'আশার ছলনে ভুলি' সম্পর্কে— যেখানে মনে হতে পারে ঃ 'খুব কি নতুন কিছু পেলাম?' আমাদের মনে হয় এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর আদ্যন্ত গ্রন্থ পঠনের মধ্যেই নিবদ্ধ। কেননা গোলাম মুরশিদ প্রতিটি বিষয়ই তথ্যসহ পরিবেশন করেছেন। এজন্যে তাঁকে খুঁজে দেখতে হয়েছে বহু পুরাতন দলিলপত্র ও বিশ্বস্ত উপকরণ। এক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত আঁদ্রে মোরোয়ার বক্তব্য অনুযায়ী ঐতিহাসিকের সঠিক কাজটি করতে পেরেছেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, গ্রেজ ইনের লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রোডস লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি, ভার্সাই মিউনিসিপ্যাল আর্কাইভস, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিসহ কোলকাতা ও মাদ্রাজের বহু লাইব্রেরিতে পুরানো নথিপত্র দেখে লেখক যে খুঁটিনাটি তথ্যগুলো পরিবেশন করেছেন এতে মধুসূদনের জীবনী পুনর্গঠিত হলো

বলে মনে করি। গ্রন্থে কতিপয় মূল্যবান দলিলপত্রের ফটোকপি সংযোজিত হয়েছে ; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ হেনরিয়েটার কন্যার জন্ম-সনদ, বিশপস্ কলেজের পাঠক্রম, মধুসূদনের পরীক্ষার খাতা, কবির বিয়ের দলিল, সমকালে Athenaeum ও Bengal Hurkaru পত্রিকায় প্রকাশিত The CaptiveLadie-র সমালোচনা, মাদ্রাজের স্কুল রুটিন, তাঁর গ্রন্থগুলোর প্রথম প্রকাশের নামপত্র, সন্তানদের ব্যাপটিজমের দলিল, গ্রেজ ইনে ভর্তির আবেদনপত্র, শর্মিষ্ঠার বিয়ের দলিল ; এ ছাড়াও আরও বহু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অনুলিপি। তবে কবি অথবা হেনরিয়েটা কারও মৃত্যু সনদ প্রসঙ্গে উল্লেখ নেই, বোধ করি সেটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এটি ছাড়া আর সব দলিল দস্তাবেজই যে মুরশিদ সাহেব সংগ্রহ করেছিলেন সে প্রমাণ গ্রন্থে আছে। জাহাজে কোন্ কোন্ যাত্রী ছিলো, কবি কখন জাহাজ থেকে নামলেন এই তথ্যগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু লেখক তা' করেন নি। সেকালের শেফার্ডস বুশের মানচিত্র হাজির করে তিনি দেখিয়েছেন যে, লণ্ডনের কতো বাইরে কী গ্রাম্য জায়গায় অর্থ-কষ্টের জন্যে কবিকে অবস্থান করতে হয়েছিলো। হেনরিয়েটার বংশনাম সম্পর্কিত তথ্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। প্রবাসী পৌত্র কর্তৃক স্থাপিত স্মৃতি-ফলকে লেখা ছিলো ঃ

AMELIA HENRIETTA (DIQUE)--এবং এই সূত্রে আমরা এযাবৎকাল Dique হেনরিয়েটার বংশ-নাম বলে জেনে এসেছি। গোলাম মুরশিদ উপস্থাপিত প্রমাণে জানা গেলো, Dique নয় White হেনরিয়েটার বংশ-নাম। কন্যার জন্ম-দলিলে উল্লেখ আছে ঃ '[.....] declared that Amelia Henrietta Sophia White aged 27 years, wife of Michael Madhusudana Dutt, barrister, aged 33, with whom she lives [...]". অনাথ রেবেকার বিয়ের রেজিস্টারে পুরো নাম লেখা হয় রেবেকা টমসন ম্যাকটাভিশ। কিন্তু রেবেকার পিতার নাম রবার্ট টমসন হওয়ায় রেবেকার নামে লেখক অসঙ্গতির সন্ধান পেয়েছেন (পৃ. ১০২)

কোন শিল্পীর জীবনী রচনার ক্ষেত্রে রচয়িতাকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয়। কেননা, বর্ণিতব্য ব্যক্তিটি একাধারে ব্যক্তি-মন ও শিল্পী-মন নিয়ে বিরাজমান ছিলো। এই দুটো সত্তায় প্রারম্ভ যেমন এক বিন্দুতে নয়, অগ্রসরও সমানতালে সমরেখায় হতে পারে না। এজন্যে জীবনীকারকে ব্যক্তিজীবনের চিত্র অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী-জীবনের চিত্রটিও আঁকতে হয়। নইলে ওই জীবনী আর দশটি মানুষের গড়-পড়তা থেকে পৃথক হতে পারে না। গোলাম মুরশিদও তাই এই জীবনী রচনা কালে মধুসূদনের মানস গড়ে ওঠার অনুপুঙ্খ উল্লেখ করেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন তাঁর মধ্যে দ্বৈত সত্তার।

মধুসূদনের মনে কবি হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি ইহজাগতিক ভোগবাদও প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। আত্মাভিমানী এই মানুষটির ব্যক্তিজীবন, বিশেষ করে রেবেকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও চারটি সন্তানকে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করার অপরাধবোধ তাঁকে আত্মদহনে জর্জরিত করতে পারে। গোলাম মুরশিদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ

> আসলে তাঁর চরিত্রের একেবারে গভীরে বৈরাগ্যের এই বীজ বপন করা ছিলো। বন্ধুবৎসল, প্রেমিক স্বামী এবং সন্তানবৎসল রসিক মাইকেল তাই জনারণ্যের মধ্যে থেকেও এক-এক সময়ে নিঃসঙ্গ এবং উদাস হয়ে যেতেন। তখন সব কিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হতো। (পৃ. ১৭৩)

মধুসূদন দেশে থাকাকালে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রশংসা করে নিজের বাঙালিত্ব পরিহারে সচেষ্ট হলেও 'সিলোন' জাহাজে চড়ে ইংল্যাণ্ড যাত্রার সময়ই শ্বেতাঙ্গদের ভিড়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁর আন্তঃমনে জাগরুক হয়ে উঠেছে স্বাজাত্যবোধ। দেশ ও দেশের মানুষের জন্যে সম্ভবত এই প্রথম টান অনুভব করেন কবি। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "আহা, এই জাহাজে যদি আমাদের দেশের অর্ধ-ডজন লোকও থাকতো! তাহলে তাঁদের নিয়ে আমাদের নিজেদের একটা দল তৈরি করতাম।" ব্যারিস্টারিতে ভর্তি হওয়ার সময়ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরেরা নিজেদের নাম যতোটা পারা যায় ইংরেজি কায়দায় বানান লিখেছেন। অথচ বিলেতি কায়দায় অভ্যস্ত M. M. Dutt নাম ও পিতার নাম লিখলেন সংস্কৃত-ঘেঁষা বানানে ঃ 'Michael Madhusudana Datta, only son of Rajnarayana Datta.' পরবর্তী সময় লেখা কপোতাক্ষ নদ সনেটটিতে জন্মভূমির প্রতি তাঁর আন্তরিক টানের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনের এহেন অবস্থাকে গোলাম মুরশিদ নিজের স্বরূপ নিয়ে সংকট হিসেবে অভিহিত করে লিখেছেন ঃ

> মস্তো বড়ো সৃজনশীল একজন শিল্পীর জন্যে যা স্বাভাবিক—তিনি এমন একটি জটিল মনের অধিকারী ছিলেন, যা তাঁকে অসুখী করতে বাধ্য। প্রাচ্যে জন্মেও তাঁর মনন এবং মানসিকতা গড়ে উঠেছিলো পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং মুল্যবোধে। আবার তিনি যখন পাশ্চাত্যকে সমস্ত অন্তর দিয়ে আলিঙ্গন করতে গেছেন, তখন প্রাচ্যের প্রতি তাঁর সহজাত দরদ, তাঁকে কিছুতেই পাশ্চাত্যের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হতে দেয় নি। এই দুয়ের সমন্বয় তিনি কোনদিন করতে পারেন নি। যেমন লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মধ্যেও কোনো একজনকে পুরোপুরি বর্জন করে অন্য একজনকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি অসুখী হবার মতো মানসিকতা নিয়েই প্রথম যৌবন থেকে বড় হয়েছিলেন। (পৃ. ২৩৮)

এতদ্‌সত্ত্বেও মধুসূদন রোমান্টিক। গোলাম মুরশিদ তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন 'জন্ম-রোম্যান্টিক' বলে (পৃ. ২৬৩)। এই রোমান্টিকতা তাঁর বক্তি-জীবনে যেমন, কাব্য-সৃষ্টিতেও সমানভাবে লক্ষ্য করা যায়। ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রস্তর দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন আধুনিক সাহিত্যের রোমান্টিক তাজমহল। বন্ধু গৌরদাসকে কবি লিখেছিলেন, "আমি এখনও রোমান্টিক আছি, কারণ তুমি তো জানোই, এটা হলো আমার প্রকৃতি।" এর আগেও মনোমোহন ঘোষকে লেখা এক চিঠিতে লক্ষ্য করা যায়, ইংল্যাণ্ডের রাজপ্রাসাদের 'শুকনো ঐতিহাসিক তথ্যে'র মধ্যে তিনি 'একটি রোমান্টিক বাস্তবতা'র সন্ধান পেয়েছেন। আসলে ইউরোপের রেনেসাঁসের প্রভাবের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাই "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, জাতিপ্রেম, স্বদেশপ্রীতি, পুরুষকারে আস্থা, ঐহিক জীবনবাদ, বিদ্রোহানুরাগ, ব্যক্তিসত্তায় ও মানবপ্রীতিতে গুরুত্ব এবং হৃদয়াবেগে মর্যাদাদান প্রভৃতি তাঁরও রচনার বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। ফলে আঙ্গিকে তিনি ক্লাসিক হলেও প্রেরণায় পুরোপুরি রোমান্টিক।"[৬] পেত্রার্কার সঙ্গে লেখক কবির সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন— উভয়েই মনে প্রাণে রোমান্টিক কিন্তু সব সময় ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছেন। গোলাম মুরশিদ তুলনামূলক আলোচনায় শার্ল পিয়ের বোদলেয়ার, ভিক্টর হুগো এবং লর্ড টেনিসনের সঙ্গে কবির ব্যক্তি ও কর্মজীবনের সাদৃশ্য আদৌ দেখা যায় কিনা তা' অনুসন্ধান করেছেন।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত The Anglo-Saxon and the Hindu বক্তৃতাটিতে মধুসূদনের 'পরস্পর বিরোধী মুল্যবোধে'র একটি দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠলেও কবি 'ভারতবর্ষীয় অনেক কিছুকেই ঘৃণা করতে শিখেছিলেন' (পৃ. ১৪৫) বলে গোলাম মুরশিদ যে মন্তব্য করেছেন তা' সম্পূর্ণ মেনে নেয়া কষ্টকর। বিশেষ করে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি একাগ্রতার কথা বিবেচনা করলে। কেননা অর্থ-কষ্টের মধ্যেও সুদুর কোলকাতা থেকে বাংলা রামায়ণ-মহাভারত তিনি মাদ্রাজে পড়ার জন্যে আনিয়েছিলেন। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 'চমৎকার ইংরেজ স্ত্রী [রেবেকা] ও চারটি সন্তান' পরিত্যাগ করে পিতৃ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে মধুসূদন সুদূর মাদ্রাজ থেকে কোলকাতায় এলেও লেখক এই অধ্যায়ে তাঁর পিতৃ সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা ও নানা জটিলতার দিকটি পুরোপুরি অনুল্লিখিত রেখে শুধু কবির বাংলা সাহিত্য চর্চা ও প্রতিষ্ঠার দিকটি গুরুত্ব দিয়েছেন। জীবনী পাঠকদের কাছে এখানে খানিকটা অতৃপ্তির ছোঁয়া লাগতে পারে। অন্যত্র গোলাম মুরশিদ লিখেছেন ঃ

> ... রাম এবং রাবণকে এমন ঐতিহ্য-বিরোধী ভাবমূর্তিতে তিনি কল্পনা করতে পারতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ

মনে হয়, তাহলো তাঁর ধর্মান্তর: সন্দেহের অবকাশ নেই যে, খৃস্টান হবার দরুন এই অসাধ্য সাধন করা তার পক্ষে সহজ হয়েছে। (পৃ. ২১০)

— এই মন্তব্যটি অতি সরলীকরণ বলে মনে হয়। মধুসূদনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ সম্পূর্ণ পার্থিব লাভের আশায়—একথা বর্তমান গ্রন্থেও আলোচিত হয়েছে। কবি বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন যে, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীকে মোচড় দিলেই উৎকৃষ্টতম রস পাওয়া যায়। অতএব, ধর্মান্তরের জন্যে নয়, উৎকৃষ্টতম রসের আশায় মোচড় দিয়ে মধুসূদন রাম ও রাবণ ঐতিহ্য-বিরোধী করে তুলেছেন। উনিশ শতকের রেনেসাঁসের ফলশ্রুতিই এই ঐতিহ্য বিরোধিতার মূলে। মাদ্রাজের রাবণ পূজোর প্রভাব এখানে পড়েছিলো কিনা তাও বিচার্য। পরবর্তীকালে দেখা গেছে মীর মশাররফ হোসেনও বিষাদসিন্ধুতে এজিদ ও সীমারকে ঐতিহ্য-বিরোধী করে তুলেছেন—এজন্যে তাঁকে ধর্মান্তরিত হতে হয়নি। সর্বশেষ অধ্যায়ে মধুসূদনের ঢাকায় আগমন সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যতটুকু তথ্য পরিবেশন করেন তার চেয়ে নতুন কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে পাঠকের উৎসাহ অনেক বেশি ছিলো। সুরেশচন্দ্র মৈত্র, ক্ষেত্র গুপ্তের (সম্পাদিত পত্রাবলী) সঙ্গে গোলাম মুরশিদের অধ্যায় বিভাজনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, লেখক কবিকে ক্বচিৎ 'মাইকেল' সম্বোধিত করেছেন, তানা হলে 'মধু'ই উল্লেখ করেছেন বেশি— 'মধুসূদন' এক বারও নয়। এই প্রবণতাও সম্ভবত সুরেশ মৈত্র প্রভাবিত। বন্ধু গৌরদাস বসাক মধুসূদনকে 'মধু' সম্বোধন করতে পারেন, নগেন্দ্রনাথ সোমের গ্রন্থনাম 'মধুস্মৃতি' হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধরনের নাম সাহিত্য সমালোচনায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে শোভনতার দিকটি বোধ করি ভেবে দেখা দরকার। তা' ছাড়া খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও মৃত্যুর পূর্বে কবি 'মাইকেলে'র চাইতে 'দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন' বলে পরিচয় দিতেই পছন্দ করতেন। একারণেই বঙ্কিমচন্দ্র 'সুপবন বহিতেছে দেখিয়া' পতাকায় 'শ্রীমধুসূদন' লেখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

গোলাম মুরশিদ তাঁর 'আশার ছলেন ভুলি'তে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ এবং যৌক্তিক পারম্পর্যে ঋদ্ধ। বক্তব্য পাঠকের হৃদয়-আঙ্গিনায় না পৌছে দিয়ে তিনি ক্ষান্ত নন। সুরেশ চন্দ্র মৈত্র মধুসূদনের পরধর্ম গ্রহণের কারণ সম্পর্কে সামান্যই ইঙ্গিত দিয়েছেন ঃ

... তাঁর খ্রীস্টান হবার ব্যাকুলতা ১৮৪২ সনের নভেম্বরের পূর্বে দেখা দেয় নি ; এবং সে ব্যাকুলতা ধর্মপিপাসুর ব্যাকুলতা নয়।[৭]

গোলাম মুরশিদের এতদ্বিষয়ক অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক ঃ

তিনি [মধুসূদন] ভেবেছিলেন, খৃস্টান হবার শর্ত হিসেবে মিশনারিদের কাছে দাবি করবেন, তাঁকে বিলেতে পাঠানো হোক। বিলেত চলে গেলে তিনি বিয়ে এড়াতে

> পারবেন, যে বাবা-মা তাঁকে জোর করে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাদের আচ্ছা জব্দ করতে পারবেন, আর সবচেয়ে বড়ো লাভ হবে তিনি এতো কাল বিলেতে গিয়ে কবি হবার যে স্বপ্ন দেখেছেন, তাকে বাস্তবায়িত করার একটা সুবর্ণ সুযোগ পাবেন। (পৃ. ৬০)

অর্থাৎ একান্তই ইহজাগতিক লাভের আশায় মধুসূদন ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন, পারলৌকিক শান্তি ও মুক্তির আশায় নয়।

সংবেদনশীল ভাষায় নরম উপস্থাপনা এই গ্রন্থের প্রধান গুণ। ক্ষীণতম সূত্র অবলম্বন করেই লেখক অগ্রসর হন সামনে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন রেখে। পাঠকের টেনশনকে পরিশীলিত করে সৃষ্টি করেন এক সম্মোহন ঃ পাঠক এগিয়ে যান, আসলে এগিয়ে যেতে তাঁর ভালো লাগে। মধুসূদনের ইংল্যাণ্ড যাত্রার উল্লেখের সময় সুরেশচন্দ্র মৈত্র যেখানে সামান্য তথ্য প্রদানেই ক্ষান্ত, গোলাম মুরশিদ সেখানে অনুমান-কল্পনায় শিল্পিত। এই শিল্পরস জারনের ফলে গোলাম মুরশিদ রচিত জীবনী অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দীর্ঘ হলেও এ প্রসঙ্গে দুটো উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে ঃ

(ক) সুরেশচন্দ্র মৈত্র ঃ

> ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে ৯ই জুন কান্তিয়া জাহাজে চড়ে তিনি (মধুসূদন) বিলেত যাত্রা করলেন ; মাদ্রাজে যিনি পরিত্যক্তা, তাঁর কথা কি মনে পড়েছিল ?[৮]

(খ) গোলাম মুরশিদ ঃ

> তাঁর জাহাজ মাদ্রাসে গিয়ে পৌঁছে তিনদিন পর ১২ জুন তারিখে। স্মৃতি-ভরা মাদ্রাসকে দেখে তাঁর সমগ্র অন্তর কী বেদনায় মথিত হয়েছিলো, তা আমরা কেবল অনুমান করতে পারি। প্রায় চার বছর ধরে হেনরিয়েটার সঙ্গে ঘর করলেও, রেবেকাকে তিনি ভুলে যেতে পারেন নি, তা বলা বাহুল্য। তাছাড়া রেবেকার প্রতি মনোভাব যেমনই হোক না কেন, ছোটো ছোটো যে-সন্তানদের তিনি ফেলে গিয়েছিলেন—ব্যর্থা, ফিবি, জর্জ আর মাইকেল—তাদের জন্যে তাঁর মন কেমন উতলা হয়েছিলো, তা-ও শুধু অনুমান করা যেতে পারে। আগেই লক্ষ্য করেছি, কনিষ্ঠ পুত্র মাইকেল মারা গিয়েছিলো কবি মাদ্রাস ছাড়ার তিন মাসের মধ্যে। কিন্তু ব্যর্থা ততোদিনে তেরো বছরের কিশোরী হতে চলেছে। ফিবি এগারো বছরের বালিকা। জর্জের বয়স দশ হতে বাকী একমাস। কেমন হয়েছে ওরা দেখতে ! কী পড়ছে? কোন স্কুলে পড়ে? লেখাপড়ায় কেমন হয়েছে? কেমন করে চলছে ওদের সংসার? নানা প্রশ্নই তাঁর মনকে ব্যাকুল করে থাকবে।(পৃ. ২৩৬-৩৭)

এই নাট্যিক উত্তেজনা পাঠককে মূল জীবনীর অন্তঃমূলে প্রোথিত রসের প্রতি ইঙ্গিত করে। মোরোয়া জীবনীকে উপন্যাসে পর্যবসিত করার ঘোরতর বিরোধী থাকলেও এই ধরনের কিছুটা রঙের প্রলেপ মেশানো আবশ্যিক বলে মনে করেছেন। এবং বলেছেন যে, তবেই "জীবনী পাঠকের উপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে। পাঠক জীবনী পড়ে ভাববে, এইতো একটি জীবন—তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-পরাজয়—সব আমারই মতো, তবু সংগ্রামের মধ্যে তিনি জীবনকে মহৎ এবং সৌন্দর্যময় করে তুলেছিলেন।"[৯]— এই বিচারে গোলাম মুরশিদ রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী গ্রন্থ 'আশার ছলনে ভুলি' সার্বিকভাবে সার্থক। মধুসূদনের অন্য জীবনী গ্রন্থগুলো থেকে এর স্বাতন্ত্র্য শুধু শিরোনামে নয়, নতুন তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, পরিবেশনা ও রস সৃষ্টিতে।

তথ্যনির্দেশ

১. আঁদ্রে মোরোয়া, *শিল্পীর সাধনা*, অনুবাদ ঃ আবু জাফর শামসুদ্দীন, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৯

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য-সাধকচরিতমালা*-২৩ (মধুসূদন দত্ত) সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, পৃ. ১১৪

৩. গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি* (মাইকেল-জীবনী), ১৯৯৫, আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ; পৃ. ৮১। এর পর এই গ্রন্থ থেকে নেয়া উদ্ধৃতির পাশে শুধু পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হবে।

৪-৫. ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদক), *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী*, ১৩৭০, গ্রন্থ নিলয়, কলিকাতা, ৯৪ ও ৯৭ নং পত্র ; পৃ. ২০৭ ও ২১২

৬. আহমদ শরীফ, *বিচিত চিন্তা* (প্রবন্ধ : মধুসূদন অন্তর্লোক), ১৯৬৮, চৌধুরী পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা ; পৃ. ৩০৭

৭. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ জীবন ও সাহিত্য*, ১৯৮৮, দ্বিতীয় সংস্করণ পুথিপত্র, কলিকাতা ; পৃ. ৫৮

৮. *প্রাগুক্ত* ; পৃ. ১৭৬

৯. আঁদ্রে মোরোয়া, *প্রাগুক্ত* ; পৃ. ২১

সৌমিত্র শেখর*

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা